শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
শারদীয়া সংখ্যা
২০২১

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

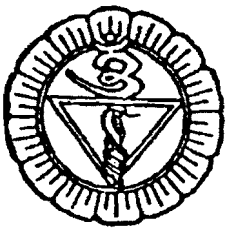

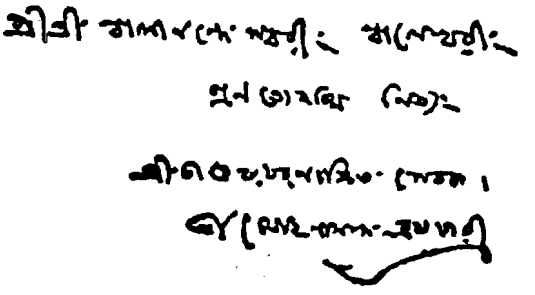

৬০ তম বর্ষ ● শুভ শারদীয়া ১৪২৮ সন ● তৃতীয় সংখ্যা

উপদেষ্টা— শ্রীসিতেন্দু গুপ্ত

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪
ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯
E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com
সেক্রেটারী: শ্রীসিতেন্দু গুপ্ত
সম্পাদিকা: শ্রীমতি কনিকা পাল
মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ২৩৫১-৪৩৭৮

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজীর সৎপ্রসঙ্গ		৫৭
শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্ট (বিশেষ জরুরী বার্তা)		৫৯
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৬২
নমঃ সর্বমঙ্গল্যা মঙ্গল্যে	শ্রীমতী রীণা মুখার্জী	৬৩
বৃন্দাবন ভ্রমণে আমি "বাঁধনকামী"	শ্রীদেবাশিস ভদ্র	৬৫
পুণ্যপরশপুলক	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৬৭
পিতৃ তর্পন	শ্রীবিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬৯
শাপে বরে রাবণ	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৭১
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী		৭৩
গুরু হে আমার	শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গুপ্ত	৭৫
God I have seen without knowing	Sri Aniruddha Ray	৭৬
মহিমা তোমার		৭৯
DURGAPUR CANCER HOSPITAL		৮০
সমবেত ভজন ও একান্তে সাধন	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৮১
আনন্দময়ীর আগমন (সম্পাদকীয়)		৮৩

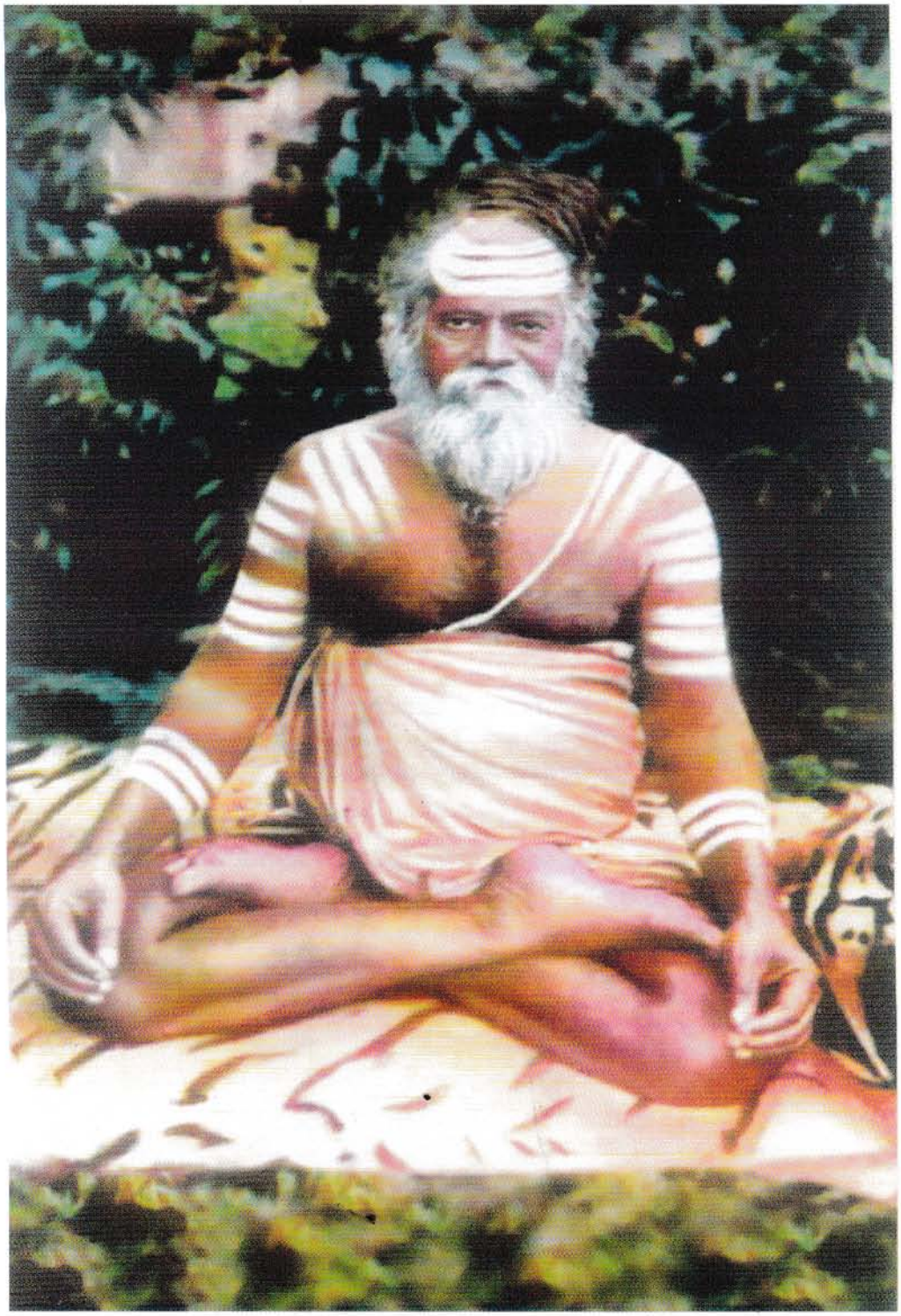

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজীর সৎপ্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১) এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, শ্রীমতী মায়াদেবী

বহুলোকের কাছে শুনি, মন্ত্রদীক্ষা লোকের একবারই হতে পারে এবং শাস্ত্রেও নাকি তাই বিধি আছে যে দীক্ষাগুরু একজনই হয়। কিন্তু আপনিতো বহুজনকেই দীক্ষাদান করেন - যাঁহারা পূর্বে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই আমার মনে হয় ইহার সঠিক ব্যাখ্যা আপনার নিকটই পাইব। আপনিতো অশাস্ত্রীয় কর্ম করেন না, তাই এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধান জানিতে ইচ্ছুক, কারণ আমিও ঐ দলভুক্ত।

উত্তর ঃ 'গুরু' শব্দের ব্যাপক অর্থ আছে। যাঁহার নিকট হইতে কোনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই সেই বিষয়ে শিষ্যের নিকট গুরু হইতে পারেন। কলা, শিল্প, বিদ্যা, শাস্ত্র, শস্ত্র, ক্রীড়া - সবক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষণ ও শিষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে। কেবল মন্ত্রদাতাকেই বা অধ্যাত্মক্ষেত্রে পথপ্রদর্শককেই গুরু বলা যায় না। গীতাতেও মন্ত্রগ্রহণ না করিয়াও অর্জুন নিজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বলিলেন, "শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" "আমি আপনাতে প্রপন্ন, আপনি আপনার এ শিষ্যকে অনুশাসন দ্বারা পরিচালন করুন।" দীক্ষাগুরুও একাধিক হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে -

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধো তথা শিষ্যঃ গুরোগুর্বান্তরং ব্রজেৎ।।"

মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও সেইরূপ এক গুরু হইতে অন্যগুরুর আশ্রয় লইতে পারে। বস্তুতঃ উপনিষদে আছে কোন এক ঋষির ১২০০ গুরুকরণ হইয়াছিল। কুলগুরুরও গুরুপদ বাচ্যের লক্ষণ ও গুণ থাকা আবশ্যক। বর্তমানে অনেকই কুলগুরুর আচার বিচার প্রতিপালন ঠিক না। যজন, যাজন অধ্যয়ণ অধ্যাপন দান ইহাই কুলগুরুবাচ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে কুলগুরুর সংখ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। কারণ সেই বংশোদ্ভবগণ এমন কর্তব্যকর্মে লিপ্ত থাকেন, যাহা কুলগুরুর পক্ষে বিহিত নহে। সে যদি কেবলমাত্র গতানুগতিক নিয়মরক্ষার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কুলগুরুকে স্বীকার করিলেও তাহাতে শিষ্যের প্রবোধন হইবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। কারণ মন্ত্রদাতাকে সেই মন্ত্রের সাধনায় সবার উপরে থাকিতে হয়। বর্তমানে অনেকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াও বেদ বা গায়ত্রীর অনুশীলন করেন না। সুতরাং গুরু বা শিষ্য লক্ষণ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রসম্মত না হইলেও দীক্ষার কোনও ফলোদয় হয় বলিয়া মনে করি না। দীক্ষাগ্রহণ আবার শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যাঁর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা নাই, যাঁর আচার-বিচারের প্রতি শিষ্যের বিশ্বাস নাই, তাঁর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণে কি ফলোদয় হইতে পারে? সুতরাং বৈদিক ও তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা কুলগুরুর প্রথা বর্তমানে নাই বলিলেও চলে। এক্ষণে বহু সম্প্রদায় বহু সাধনার অভিনব প্রবর্তন দেখা যাইতেছে। অনেকেই নূতন নূতন শাস্ত্র ও অনুশাসন রচনা করিয়া নিজ সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং সনাতন পরম্পরাক্রমে কোনও বিধানই বর্তমানে যুগোপযোগী নহে।

"শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষঃ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। শ্রদ্ধাই অধ্যাত্ম প্রগতির মূল।

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।"

শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তপঃ বা যাহা কিছু দান করা যায় সবই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা - ইহ ও পরকালের কোনও কল্যাণই সাধন করিতে পারে না। তবে একটি কথা। মন্ত্র যদি শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ হয় তবে যে কোনও নিষ্ঠাবান সাধনতৎপর বা সিদ্ধ পুরুষের মুখারবিন্দ হইতে শ্রবণ করিয়া সাধক নিজ সাধনায় দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা সেই মন্ত্রই সিদ্ধরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণের পর আর অন্য গুরুকরণের প্রয়োজন থাকে না। দ্বিজগণের পক্ষে যজ্ঞোপবীতকালীন যে গায়ত্রী দেওয়া হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পিতা আচার্য্য বা কুলগুরুর নিকট গায়ত্রী দীক্ষা লওয়া হয় তথাপি পুনঃ অন্যগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রান্তর গ্রহণের বিধি আছে। সুতরাং দেখা যায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিলেও যদি সেই দীক্ষা গ্রহণে ফলোদয় বা অভিমত কল্যাণ লাভ না হয় তবে আত্মকল্যাণ লাভের জন্য সাধক বা শিষ্য নিজ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুকূল অন্য গুরুর নিকটেও সেই মন্ত্রই বা অন্যমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

২। শ্রীমতী মালাদেবীর প্রশ্ন।

প্রশ্নঃ গুরুকরণের প্রয়োজন কি প্রত্যেক মানুষের জন্যই?

উত্তর ঃ "গুরু" শব্দটি প্রয়োগ না হইলেও শিক্ষক ও শিষ্য সম্বন্ধ দ্বারা জ্ঞানলাভের বা প্রশিক্ষণ লাভের প্রথা সার্বভৌম। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি, পারসী বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল মনুষ্যের মধ্যেই অধ্যাত্মচেতনার আরম্ভ হইলেই এই সম্বন্ধপরিগৃহীত বাধ্য। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা অধ্যাত্মজগতে প্রবেশেচ্ছু ও আত্মকল্যাণকামী প্রতি হিন্দুর জন্যই আবশ্যক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এমনকি গুরুমন্ত্র লাভ না হইলে শরীর শুদ্ধ হয়না এবং পারলৌকিক কল্যাণময়ী গতি লাভ হয়না এরূপ শাস্ত্রের নির্দেশ রহিয়াছে। খৃষ্টানগণও শিশু জন্ম গ্রহণের অত্যল্প পরেই তাকে Baptise করেন। এই সংস্কারও মন্ত্রপূত জল দ্বারাই সাধিত হয়। Unbaptised soul এর গতি হয় না, Heathen বলিয়া অভিহিত হয়েন।

প্রশ্নঃ ৩। দীক্ষাগুরু (কানে যিনি মন্ত্র দেন) ও মন্ত্রগুরু (যিনি পত্রে লিখে দেন) এঁদের মধ্যে কি খুব বেশি প্রভেদ আছে?

উত্তর ঃ দীক্ষাগুরু ও মন্ত্রগুরু একই অর্থবাচ্য। তবে লিখিত মন্ত্রদাতা অপেক্ষা দীক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য আছে। এমন কি স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রও কোন দেহধারী গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হয়। শিক্ষাগুরু সাধনার প্রণালী বলিয়া দেন। শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ৪। দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু একজন থাকিলেও একাধিক শিক্ষাগুরুতো জীবনে গ্রহণ করা যায়? দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়কেই কি আমরা সমান আসনে বসাতে পারি?

উত্তর ঃ শিক্ষাগুরু অপেক্ষা দীক্ষাগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্ট

বিশেষ জরুরী বার্তা

শিবস্বরূপ পরম যোগী শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেওঘর "শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রম" ১১৭ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। এই আশ্রম ভারতীয় সনাতন ধর্মের অনুগামী হয়ে এক ঐতিহ্যময় সমাজ সেবামূলক কর্মের উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতে ও বিদেশে সুপরিচিত।

পরমগুরুমহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী ও আমাদের পরম আরাধ্য গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ দ্বারা প্রবর্তিত যাবতীয় ধার্মিক কার্যকলাপ যথা, দুর্গাপুজো (প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ) স্বয়ং গুরুমহারাজজী প্রায় ৮০ বছর পূর্বে দেওঘর আশ্রমে এই দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন, তাছাড়াও পরমগুরুমহারাজজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে দোল পূর্ণিমা অবধি তিনদিন ব্যাপী যজ্ঞ, পরমগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি উৎসব, গুরু পূর্ণিমা উৎসব, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি, ঁলক্ষ্মীপুজো, ঁকালীপুজো, অন্নকূট উৎসব, জগদ্ধাত্রী পুজো, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর জন্মতিথি উৎসব, আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবালা-ত্রিপুরাসুন্দরী মাতার প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং একইদিনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব, এছাড়া তপোবন আশ্রমে পরম গুরুমহারাজজীর মাতা নর্মদামাতার তিরোধান তিথি উৎসব এখনও পর্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও পালন করা হবে।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্টের বর্তমান ট্রাস্টিরা এই ঐতিহ্যময় ধার্মিক পরম্পরা যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকে তার জন্য সদাই সচেষ্ট আছেন।

আমাদের গুরুমহারাজজী ব্রহ্মলীন হবার পর থেকে বিগত ২২ বছর যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ভক্তশিষ্যগণ শ্রদ্ধার সাথে আর্থিক অনুদান ও দুর্গাপুজোর সময় বস্ত্রাদি প্রভৃতি সাহায্য করে আসছেন, আমরা এদের সকলকে এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই ধার্মিক পুণ্যকাজে অংশগ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেন এবং পরমগুরুমহারাজজীর ও গুরুমহারাজজীর আশীর্বাদ স্বরূপ পুণ্য সঞ্চয় করেন।

দুর্গাপুজোর জন্য প্রাপ্ত এইসকল বস্ত্রাদি মা দুর্গার শ্রীচরণে মহাষ্টমীর দিন উৎসর্গ করে ভক্তশিষ্যদের মধ্যে প্রসাদী বস্ত্ররূপে বিতরণ করা হয়ে থাকে এবং নিকটস্থ গ্রামগুলির দুঃস্থ মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোয়েটার বা গরম চাদর, শতাধিক সাধুদের মধ্যে গরমের কম্বল দান করা হয়, এইসকল সমাজসেবামূলক কাজও ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে বহুবছর ধরে।

কিন্তু সম্প্রতি এই ঐতিহ্যময় পরম পবিত্র দেওঘর আশ্রম বিরোধী বহু মিথ্যা সংবাদ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে এই আশ্রম থেকে ভক্তশিষ্যগণ বিমুখ হয়ে যান। একটি চক্রান্ত করে আশ্রমের সুপ্রাচীন ধার্মিক ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে, তাই আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এই অপপ্রচারের

মূলচক্রী যিনি, তিনি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর দীক্ষিত ব্রহ্মচারী শিষ্য শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী। যিনি বর্তমানে হৃষিকেশ আশ্রমে থাকেন।

তিনি গুরুমহারাজজীর আমেরিকার জনৈক শিষ্যাকে দেওঘর আশ্রম বিরোধী নানা বিদ্বেষমূলক খবর দিয়েছেন বা দেন এবং সেই শিষ্যা আমেরিকায় বসবাসকারী ভক্তশিষ্যদের মধ্যে এই সংবাদ সম্প্রচার করেন।

(১) বালানন্দ ট্রাস্টের ট্রাস্টি মিথ্যাবাদী।

(২) বেনারস আশ্রমে বিশ্বাত্মানন্দজীর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার খরচ বাবদ সমাজসেবা সমিতির পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা পাঠানো হয় এবং যাঁহারা সেইসময়কালে বেনারসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বলা হয়েছিল খরচার হিসাব সমাজ সেবা সমিতিতে জমা দিতে। তা সত্ত্বেও দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মিথ্যা রটনা করে বেড়িয়েছেন যে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কিছুই পাঠানো হয়নি। টাকার রসিদ অবশ্য তাঁরা দিয়েছেন। রসিদ নং ০৬৮, তারিখ ০৩/০৫/২০২১ শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমের রসিদ যা আমাদের কাছে আছে।

(৩) উক্ত ব্রহ্মচারী সর্বত্র রটনা করেছেন যে দেওঘর আশ্রমে রিসিভার বসেছে। এই বছরে দুর্গাপুজো হবার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে - এই কথা সর্বৈব মিথ্যা। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তিনি এই বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার করে ভক্তশিষ্যদের বিভ্রান্ত করার এক ঘৃণ্য মানসিকতায় মেতেছেন। তিনি আরও বলে বেড়াচ্ছেন যে তিনি নিজে আশ্রমে (হৃষিকেশ) দুর্গাপুজো করছেন এবং সব টাকা যেন তাঁকেই পাঠানো হয় (তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে)। তিনি সবসময় মনে করেন যে তিনি সততার প্রতিমূর্তি - যদি তাই-ই হয় তাহলে "শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ট্রাস্ট"-এ ব্যাঙ্কঅ্যাকাউন্ট নং কেন দেন না? মা দুর্গাপ্রতিমার টাকা হয়তো তিনি দেন, কিন্তু পুজোসামগ্রী ও অন্যান্য যাবতীয় খরচতো ট্রাস্টই বহন করে।

লেখার শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে যে দেওঘর আশ্রমে ও তপোবন আশ্রমে পরম্পরাগতভাবে সমস্ত উৎসব ও তার আনুসঙ্গিক পুজো পাঠ, ভাণ্ডারা এখনও পর্যন্ত হয়ে আসছে ও ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে। এই বছর ৯ দিন ব্যাপী দুর্গাপুজো উৎসব হবে। নবমীতে শ্রীশ্রীচণ্ডীযজ্ঞ উদ্‌যাপন করা হবে। শুধুমাত্র সরকারের কোভিড নিয়মাবলী বজায় রাখার জন্য আশ্রমের কোন গেস্ট হাউস খোলা থাকবে না।

(৪) উক্ত ব্রহ্মচারী প্রচার করছেন আশ্রমের ট্রাস্টিরা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মস্যাৎ করছেন। যিনি প্রচার করছেন তিনি হয়তো এই খবরটা রাখেননি যে প্রতি বছর ট্রাস্টের হিসাব অডিট করা হয় এবং ইনকামট্যাক্সে জমা করা হয়।

(৫) উক্ত ব্রহ্মচারী সময় সময় নানারকম মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকেন। তিনি রটনা করেছেন তপোবন থেকে আশ্রম পর্যন্ত যত জমি আছে তা বিক্রয় করা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যের জমি দখলকারীদের হাত থেকে জমি রক্ষা করার জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষকে প্রায়শঃই জমিমাফিয়াদের মুখোমুখি সংঘর্ষের সন্মুখীন হতে হচ্ছে। এইসব খবর তিনি

জানেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে মিথ্যা রটনায় তিনি সিদ্ধ- এটা সকলেই নিশ্চই বুঝতে পারছেন - আসল মিথ্যাবাদী তাহলে কে?

হৃষিকেশ আশ্রমে আশ্রিত উক্ত ব্রহ্মচারী মোহনানন্দ ট্রাস্ট থেকে নিয়মিত প্রতিমাসে ৩৭,৫০০ টাকা আশ্রমের বরাদ্দ খরচা পেয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি অযথা বহু খরচ করে থাকেন এবং ট্রাস্টের *তরফ থেকে সেই অতিরিক্ত খরচাও মঞ্জুর করা হয়। তাছাড়া বাৎসরিক যজ্ঞের সময় ট্রাস্ট থেকে* অতিরিক্ত খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়। অথচ উনি ওনার বিশিষ্ট ভক্তছাড়া কাউকে যাত্রীনিবাসের ঘর দেন না। বিশেষ করে কলকাতার শিষ্য-শিষ্যাদের তো নয়ই।

উক্ত ব্রহ্মচারী কোন আশ্রমে থাকতে পারেন না। দেওঘর আশ্রমে তিনি থাকতে পারেন নি, বেনারস আশ্রমে একসময় কিছুদিন ছিলেন কিন্তু তাঁর এই কলহপ্রবণ মানসিকতার জন্য তাঁকে চলে যেতে হয়। তিনি পুনরায় সেখানে ফিরে আসতে চাইলে গুরুমহারাজজী অনুমতি দেননি।

পরবর্তীকালে গঙ্গোনাথ আশ্রমে থাকাকালীন সেই একই কারণে সেই আশ্রমও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁর এই কোন্দল স্বভাবের জন্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর স্থাপিত কোনও ট্রাস্টের ওনাকে সদস্য করা হয়নি। হয়তো বা এটাই ওনার আক্রোশের কারণ। সেই কারণে ট্রাস্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার করে থাকেন।

আমরা জানি উক্ত ব্রহ্মচারী একাই নন, তাঁর অনেক সহযোগী তাঁর পক্ষে কাজ করছেন, সেই কারণে আসল সত্যটা সকলকে তাঁদের অবগতির জন্য এই বিশেষ বার্তা।

আপনারা অযথা বিভ্রান্ত হবেন না।

জয়গুরু

শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্টের পক্ষে

শ্রীমৎ সম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারী (সেবাইত ও ম্যানেজিং ট্রাস্টি)

সুরজিত দে (ট্রাস্টি), নবকুমার চন্দ্র (ট্রাস্টি)

ও

সিঁতেন্দু গুপ্ত (ট্রাস্টি)

গীতার মর্ম

(পরবর্তী অংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

এইভাবে অন্ধপ্রবৃত্তি নৈরাশ্য আঘাতে প্রতিহত ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। মনোময়কোষে তার আমিত্ব ঘনীভূত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে, তার বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তার মধ্যে বিরাট চৈতন্যময়ী শক্তি বারবার প্রতিহত হয়। হিত এবং অহিত, এই বিচাররূপে নিবৃত্ত শক্তি ঝঙ্কার দেয় - হৃদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় - পাণ্ডবেরা যেন ইন্দ্রপ্রস্থরূপ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। কুরুক্ষেত্রের এক অংশ কৌরবের বা প্রবৃত্তির এবং এক অংশ পাণ্ডবের বা নিবৃত্তির শাসনাধীন হয়।

ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ মনোময় কোষে যুদ্ধেচ্ছু হয়ে সমাগত।

মামকাঃ - অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষ এবং পাণ্ডবাঃ - অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষ। প্রবৃত্তিপক্ষ অর্থ বিকর্ষণী আর নিবৃত্তিপক্ষ আকর্ষণ শক্তি।

আকর্ষণী শক্তি বা প্রণবই নিবৃত্তি বা আত্মাভিমুখী শক্তি। প্রবৃত্তি বা বহুমুখী চাঞ্চল্য বিগত হলেই এর সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ হয়। সেই শক্তির দ্বারাই জীব আবার শক্তিময়ী মায়ের চরণে যুক্ত হয়, স্বরূপ ফিরে পায়, সেইজন্য একে জীবের আত্মশক্তি বলে। ঐ বিকর্ষণী শক্তি বা প্রবৃত্তি বা জীবভাবীয় স্বসত্তাবোধ যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন জীব আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সাধারণ মানুষ পাণ্ডবদের নির্বাসিত অবস্থার মত প্রবৃত্তির দ্বারা আত্মরাজ্য হতে নির্বাসিত হয়ে আছে। তার চেয়ে যাঁরা একটু উন্নত, তাঁরা নির্বাসিত অবস্থা থেকে অজ্ঞাতবাস অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছেন অর্থাৎ নিত্যানিত্য বিবেক হয়েছে, কিন্তু নিত্য আত্মসত্ত্বা তখনও উপলব্ধি হয়নি, অজ্ঞাতই আছে। যাঁরা আবার এদের চেয়েও উন্নত, তাঁদের হৃদয় ক্ষেত্রে সমরায়োজন সূচিত হয়েছে।

আকর্ষণী শক্তি, প্রণব, নিবৃত্তি এ সমস্ত একই কথা। ঐ আত্মশক্তি শরীরের পঞ্চকোষে পাঁচভাগে বিভক্ত। তাদের সাধারণভাবে পঞ্চপ্রাণ বলা হয়। পঞ্চপাণ্ডব এই পঞ্চপ্রাণ। তার মধ্যে যে অংশটুকুর নাম, জীবের আত্মশক্তি তাতেই পূর্ণভাবে বিরাজিত। এই জন্য জীবাত্মাকে অর্জুন বলা হয়।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম অর্থে - প্রাণ বা হৃদয় ও মনের সংগ্রাম। সাধারণ জীব নির্বাসিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তার চিৎ বা চৈতন্যরাজ্যের উপর মনের আধিপত্য থাকে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের পূর্বে। মনে হতে পারে যুদ্ধ বন্ধ রেখে অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতা কীর্তন হয়েছিল কি? তা-ই হয়েছিল। কয়েকদণ্ডের অনুশাসনে একজন আত্মীয় এবং সমধর্মী পুরুষকে কোনও মহাপুরুষ প্রকৃতিস্থ করবেন - এটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ক্রমশঃ

নমঃ সর্বমঙ্গল্যা মঙ্গল্যে

শ্রীমতী রীণা মুখার্জী

শরতের সোনা রোদে শিউলি ঝরা দীঘির কোল ঘেঁসে মা মহামায়ার শুভাগমনের বার্তা নিয়ে পটুয়াপাড়া, কুমোরপাড়ার মাটির গন্ধ শুষে নিয়ে বাতাস ছুটে চলে মহানন্দে আটচালায়, পুজোমণ্ডপে, ধনী-দরিদ্রের আনাচে-কানাচের সর্বত্র। বর্তমান পরিস্থিতি মানুষকে যতই আতঙ্কের মধ্যে টেনে নিয়ে যাক, মা দুর্গা নাম জপ করে মানুষ মনে শান্তি পায়। অ-সুরের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য ফিরে পায় সুরের ছন্দ মহিমা।

এখন বনেদী বাড়ীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ পুজো নিয়ে কিছু তথ্যাবলী তুলে ধরতে চাই, প্রথমে আসি -

১) কাটোয়া - কটোয়ার খাজুরডিহি গ্রামের ঘোষাল পরিবারের তিনশো বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। পুজো শুরুর আগে ঢাক বাজিয়ে গ্রামের চারদিকের চার দেবদেবীর পুজো করতে হয়। যেমন - গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থান করছেন রক্ষাকালী, উত্তরদিকে ভৈরবনাথ, পশ্চিমে শিবাক্ষ্যা আর দক্ষিণে বড় ঠাকুরণ। পুজোর চারদিন মা দুর্গার সঙ্গে এই চারদিকের দেবদেবীকেও পুজো করা হয়। মা দুর্গাকে ঘোষাল বাড়ীতে দেওয়া হয় চিনির নৈবেদ্য। নবমীতে যথারীতি হয় কুমারী পুজো। গ্রামের পুরোহিত পাড়ায় বিশাল জমি নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দুর্গামন্দির। মোগল সম্রাট আকবরের কর্মচারী টোডারমল - রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষক হিসাবে ভগবান রায় কে নিয়োগ করেন। ভগবান রায়ের আরাধ্য কুলদেবতা ছিলেন রামসীতা। এখানে প্রতিষ্ঠিত রামসীতার মন্দির এখনও বর্তমান। একসময় বর্গীদের তাড়া খেয়ে মুর্শীদাবাদের ঘোষালরা সপরিবারে চলে আসেন বনজঙ্গলে ঘেরা খাজুরডিহিতে। এখানেই তাঁরা বসবাস করতে শুরু করেন। পরে এই ঘোষাল পরিবারকেই রামসীতার পুজোর দায়িত্ব দেন ভগবান রায়।

আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কাটোয়ার সোনাগ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ীর দুর্গাপুজোর আচমনের জন্য প্রয়োজন হয় কারণবারির। মাইল চারেক দূরে করুই গ্রাম থেকে আসত পুজোর কারণবারি। ভট্টাচার্য বাড়ীর লোকজনেরাই বাঁকে করে নিয়ে আসতেন টিনবন্দী কারণবারি। খবর যায় ব্রিটিশ পুলিশের কাছে। প্রকাশ্য রাস্তায় মদ আনা তখন ছিল গুরুতর অপরাধ। পুলিশ দেখতে চাইল টিনের ভিতরে কী রয়েছে? কী করে নিস্তার পাওয়া যায়, ভেবে না পেয়ে ভট্টাচার্য বাড়ীর লোকেরা বললেন - 'এতে দুধ আছে' বলে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে লাগলেন। ব্রিটিশ পুলিশের নির্দেশানুযায়ী কারণ ভর্তি টিনের ঢাকনা খুলে দেখাতে হল। সেই সময়েই উপস্থিত সামনে ঘটল বিস্ময়কর আশ্চর্য্যজনক ঘটনা - দেখা যায় ভেতরে টলটল করছে দুধ। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন এই ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গাপুজোকে ঘিরে মাহাত্ম্যের এমন নানা কাহিনী রয়েছে। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় মা দুর্গার সামনে রাখা হয় সিঁদুর ভর্তি এক বিশাল পাত্র। পুজো শেষ হবার পর দেখা যায়, সেই সিঁদুরের ওপর পড়েছে 'মায়ের চরণ চিহ্ন'। পুজো শেষ হয়ে গেলে সেই পবিত্র সিঁদুর মাথায় ঠেকানোর জন্য এয়োতিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দুর্গাপুজোর

পক্ষকাল আগে বোধনের দিন থেকেই মঙ্গলঘট ভরে এখানে শুরু হয়ে যায় পুজো, ভোগ, আরতি। পুজো হয় তন্ত্র মতে - যেহেতু গঙ্গাজলের বদলে আচমন হয় কারণবারিতে, তাই একটি বিশালাকায় তামার কোষায় সাত সমুদ্র আহ্বান করে এই কারণবারি রাখা হয়। এই পুজোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, নবমীর দিন ছাগল, মেষ, আখের সঙ্গে মহিষের বলিদান। এই বলি দেখতে আত্মীয় কুটুম্বসহ আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষজন এসে জমায়েত হয়। দশমীতে গ্রামের পুকুরে প্রতিমা বিসর্জনের পর, হাজার হাজার মানুষের সামনে শুরু হয় কুস্তি আর লাঠি খেলা। ভট্টাচার্য পরিবার থেকে জয়ীদের দেওয়া হত মোটা বখশিস।

২। এবার আসি দ্বিতীয় দুর্গাপুজো সম্বন্ধে অজানা কিছু তথ্যাবলী। প্রায় ৫০০ বছর ধরে চলছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের মৌতড় গ্রামের বৈচিত্র্যময় দুর্গাপুজো। দেবী দুর্গার নাম বুড়ি দুর্গা। মা দুর্গার চরণের তলায় নতজানু হয়ে আছে অসুর - নেই মোষ। এখানে দেবীর ডান দিকে কার্তিক আর বামদিকে থাকে গণেশ। এই বুড়ি দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি রাজা বল্লাল সেনের রাজসভায় পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ার কাশিপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। রাজা তাঁকে বসবাস করার জন্য মৌতড়ে জমি দেন। কিছু আদিবাসী সেখানে বাস করতো। গৌরীকান্ত বসতবাড়ী করার পর, রাজার দেওয়া জমি আদিবাসীদের চাষ করতে দেন। কিন্তু জমির ফসল ওঠার আগে কারা তা নিয়ে পালিয়ে যায়। বেশ কয়েকবার চাষ করেও তিনি ফসল পেলেন না। এই খবর রাজাকে জানাতেই রাজা ধান চাষ করার পরে পাহারা দেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন। এই রকম ধান ঘরে তোলার আগে গৌরীকান্তবাবু এক রাতে সৈন্যরা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছে কিনা - তা দেখতে গিয়েছিলেন।

সেই সময় দেখেন একটা বুড়িকে সৈন্যরা মাঠ থেকে আটক করেছে। মহুল ফল খেয়ে মাতালের মতন ওই বুড়ি ঢুলছিলেন। সৈন্যরা আটক করলে বুড়ি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করলেন। গৌরীকান্ত সেদিন সেরূপে দেবীকে দেখেছিলেন। প্রতিমার মূর্তি গড়াতে তিনি সেই রূপেরই নির্দেশ দেন। সে বছরই মৌতড়ে মন্দির গড়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়। তখন থেকেই দেবী দুর্গার নাম বুড়ি দুর্গা। এখনো বোধনের দিন দেবীকে গ্রামের বড় পুকুর থেকে পালকিতে করে মন্দিরে আনা হয়। দেবীর প্রসাদে অন্ন, মাছ, মাংস সহ মোট ১৩ রকমের ভোগ থাকে। যেহেতু দেবী দুর্গা মহুল খেয়ে ঢুলছিলেন তাই ভোগের সাথে কারণবারি দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীগুরু চরণে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম।

"আমায় যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।"

জয় শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ জী কী জয়।

বৃন্দাবন ভ্রমণে আমি ''বাঁধনকামী''

শেষাংশ

শ্রীদেবাশিস ভদ্র

এখন আমি সেই গানেরও সত্যতা বুঝতে পেরেছি -

''এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজেরে
তার বাঁশি শুনে বনে বনে ফুল ফোটেরে...''

নিজেকে এইবার সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুচরণে সমর্পণ করলাম যেহেতু আমার তখন দেহ ও মন কোনকিছুর উপরই আর নিয়ন্ত্রণ নেই। কোথা থেকে যে এমন একটা ঘোর আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল সেই অনুভূতি কারও সঙ্গে ভাগ করার মত ভাষাও আমার নেই। একটানা হেঁটে অবশেষে বলদেবজীর কাছে পৌঁছে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, ''আমার চুরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবারের মত সমাপ্ত করলাম। আবার যেন আসতে পারি। এবারে যা বাকী থেকে গেল তা যেন আগামীবার এসে পূরণ করতে পারি।''

শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্য এখন যেমন আমাকে শিহরিত করছে, অন্তিমেও যেন সেইরকম আমার অন্তরকে স্ফুরিত করায়, এইভাবেই আমার বিনম্র প্রণাম জানিয়ে শ্রীভগবানের শরণাগত হলাম। এরপর মন চাইলেও পা দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। আগামীকাল অর্থাৎ ২৪।১২।১৯ ভাণ্ডারীবন হয়ে রায়া হয়ে বলদেব পৌঁছাব। আমাকে এখনও প্রায় ১৬ কি.মি. পথ হাঁটতে হবে। বিকেল সাড়ে চারটে বাজল, যখন আমার বলদেব পৌঁছতে আরও ১০ কি.মি. পথ হাঁটা বাকী। আমি রাস্তার ধারে একটা খাটিয়াতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই প্রচণ্ড মনের জোর আনার চেষ্টা করলাম, খুব জোরে গুরুমহারাজজী আর রাধারাণীর জয় দিয়ে তড়িঘড়ি উঠে পড়লাম। বাকী ১০ কি.মি. পথ আমি নিজে হেঁটেছি না কেউ আমাকে হাঁটিয়েছেন সে কথা আজ আর আমার স্মরণে নেই।

''মর্ত্যধামে আঁচল আঁখে দেখ বৃন্দাবন।
প্রেমনেত্রে তাহাকেই চিন্ত সদামন।।''

শ্রীস্বরূপদাস মহারাজ।

তবে সেই পরিক্রমাকালে কি কি ঘটেছিল তার মাত্র অল্প কিছু অংশই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু একটা কথা অনস্বীকার্য যে যতবার শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করেছি; ততবারই মনে হয়েছে আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই আছেন; শাস্ত্রের সেই কথার যথার্থতা বুঝতে পারলাম। ''শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে''। গুরুকৃপা ছাড়া কোন ভক্তই সাধনে সমর্থ্য হতে পারে না ''গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি'' যিনি যতই কৃপা করুননা কেন, যতক্ষণ শ্রীগুরুদেব করুণা করে হৃদয়খানি গ্রহণের যোগ্য করে দিচ্ছেন, ততক্ষণ একবিন্দুও তা স্ফুরিত হতে পারে না। সত্যিকথা বলতে গেলে এমনই একভাবে নিজেই বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম, চোখ দিয়ে জলের ধারা, প্রাণ আবেগে পরিপূর্ণ, বাক্‌রহিত হয়ে গেলাম; এটুকুও বুঝলাম আমাকে যে ফিরতে হবে প্রথমে বৃন্দাবন আশ্রম, তারপর দিল্লী, তারপর কোলকাতা - এই সম্বিৎ যেন

শ্রীগুরুই জাগালেন। আর ফেরার সময়েও শ্রীগুরুদেবের কতটা কৃপা পেয়েছি, সে কথা অন্য কোন সময়ে লিখব। সবশেষে বলি -

"অকিঞ্চন জনে রেখ শ্রীচরণে
শ্রীগুরু করুণাময় -
যেন আমা হ'তে তুয়া শুদ্ধ পথে
কলঙ্ক নাহিক রয়।।"

চরিতসুধা

সামনেই আসছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও তার পনেরো দিন পরে রাধাষ্টমী। আসুন আমরা সবাই এই মন্ত্রে রাধাকে প্রণাম জানাই -

"তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীরাধে বৃন্দাবনেশ্বরী
বৃষভানুসূতে দেবী ত্বং নমামি হরিপ্রিয়ে।"

জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে।।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

"আসলে জগৎরঙ্গমঞ্চে একটা নাটকই চিরকাল চলছে যার নাম 'জীবন'। মঞ্চে প্রবেশ আর প্রস্থান, এ-দুয়ের মাঝখানে 'অ্যাকশন' - এরই নাম জীবননাট্য। সব মানুষ একরকম হতে পারে না বলেই জীবননাট্যের বৈচিত্র্যও অসীম। নিত্যকার এই উত্থান-পতন, সংশয়-দ্বন্দ্ব - অবিশ্বাসের মধ্যেও প্রতি শতাব্দীতে এমন কিছু মানুষ আসেন, যঁদের জীবনে লক্ষিত হয় একটি নির্দিষ্ট ব্রতের নিরলস উদ্‌যাপন...."

লেখক ঁপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

হ্যাঁ, আমাদের প্রশান্তদা - শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর গানে গানে শুধু যে ভরালেন আলো এই ভুবনে; কেবল তাইই নয় নিখুঁত ছিলেন তিনি বহুবছর ধরে এই বালেশ্বরী পত্রিকার সম্পাদনে - আজ তিনি নেই; গত ২৯শে আষাঢ় ১৪২৮, ইং ১৪ই জুলাই ২০২১ বুধবার শ্রীগুরুর শ্রীচরণে তিনি চিরপ্রশান্তি লাভ করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন গুরুগত প্রাণ ও শ্রীগুরুর স্নেহ ধন্য। তাঁর একমাত্র পুত্র বর্তমান।

আসুন আমরা মিলিতভাবে আমাদের পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকের বিদেহী আত্মার মুক্তির জন্য শ্রীগুরু চরণে প্রার্থনা জানাই।।

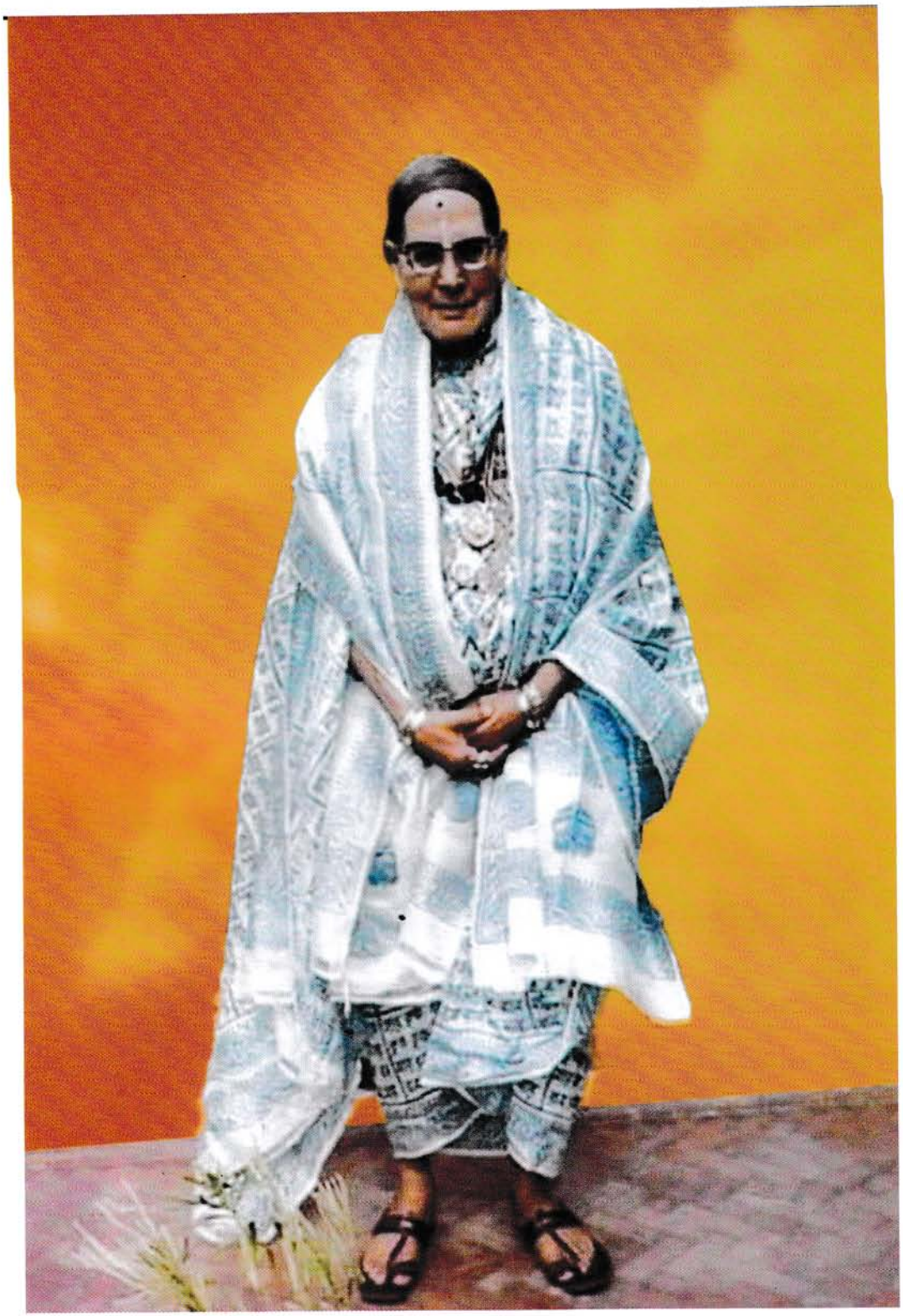

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীশঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

পুণ্যপরশপুলক পর্ব (৩)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

গুরুমহারাজের কথা তিনি যদি না লেখান, তবে লেখা অসম্ভব। ঐযে গীতাতে বলেছে না, 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' - এযে কত বড় সত্যি কথা তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি আর কারও কথা জানিনা, ভগবান টগবান ওসবও কিছু বুঝিনা, আমি বুঝি গুরুমহারাজের ব্যাপারে এই কথা একশোর মধ্যে পাঁচশোভাগ সত্যি। তিনি ইচ্ছা করলেই সব হতে পারে; নাহলে কিছুই হবে না - মাথা কুটে মরে গেলেও হবে না।

না না, নিজেকে বড় করে তোলার জন্যে গুরুমহারাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি না। তিনি সমস্ত রকম আরোপের ওপরে অবস্থান করেন। ওই শিবমহিম্ন স্তোত্রে যেমন বলেছে না, চন্দনেও যেমন ভস্মেও তেমন - ঠিক সেইরকম। কে তাঁকে কোথায় তুললো কোথায় ফেললো, এসব নিয়ে তাঁর কোন চিন্তাই নেই। একবার ধানবাদে সান্ধ্যভ্রমণের সময় এমন এক ভক্তের বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন, যাঁদের বাড়িতে মহামানবকে বসানোর স্থানটুকুও ছিল না। তাঁরা তাঁকে বসতে দিয়েছিলেন মাটির জোড়া উনুনের ওপর তক্তা পেতে তার ওপর আসন বিছিয়ে। সেখানে গিয়ে সেই আসনে বসে তাঁদের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর মহানন্দে বাতাসা লুট দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে নরম পশমের গদীও যেমন, উনুনের ওপর কাঠের তক্তা কিম্বা পিঁড়ি পেতে ক্ষণকালের জন্য তৈরি করা সিংহাসনও তেমন। তাই বলছিলাম যে ওইসব কথা বলে কারো কোন বিশেষ কল্পিত আনুকূল্যও পেতে চাইছি না। এমনিতেই তিনি যেভাবে প্রতিনিয়ত কৃপা করে চলেছেন তাতো বলে বোঝানোর নয়। ঠিক সেইরকমই তিনি ইচ্ছা না করলে যে আমরা কিছুই করতে পারিনা। **এই সত্যের জীবন্ত প্রমাণ প্রথম পেয়েছিলাম আমার কলেজ** জীবনে।

বালিগঞ্জে জামিরলেনে ছিল আমার কলেজ। কলেজের পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে রাস্তা আর গলিগুলো চেনার চেষ্টা প্রায়ই করতাম। সেইরকম সময় একদিন খবরের কাগজে দেখলাম, গুরুমহারাজ আসছেন বালিগঞ্জ প্লেসের একটা বাড়িতে। ওবাড়ি আমাদের কলেজের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে ফেললাম, কলেজ থেকে বেরিয়ে একসময় গুরুমহারাজকে প্রণাম করে আসব। বাবা বললেন, 'কিরে তুই চিনতে পারবি তো?' কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই বললাম, 'না চেনার কী আছে? ওতো আমাদের কলেজের কাছে। রোজ ঐ রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, আর চিনতে পারব না!.... তাছাড়া গুরুমহারাজ মানেই অনেক গাড়ির ভীড়। ফুল মালার দোকান। আর পথচলতি কপালে বিভূতি লাগানো কাউকে না কাউকেতো দেখতেই পাব। তুমি চিন্তা কোরো না।' গুরুমহারাজের মালার জন্য মা দুটাকা হাতে দিলেন। খুশি খুশি মনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কলেজের ক্লাসগুলো করতে মোটেও ভালো লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল ক্লাসের সময়গুলো যেন বড্ড বেশী বেশী! কিন্তু না করলেই নয়, তাই ছুটির অপেক্ষায় ক্লাস করতে লাগলাম। ছুটির পর আর কোন বন্ধুকে সঙ্গে নিলাম না। কেননা, বন্ধুরা কে কেমন মনের সেটা

জানিনা। তাছাড়া গুরুমহারাজকে ভাগ বাঁটোয়ারা করার ব্যাপারে আমার ঔদার্যের কিছু অভাব আছে। উনি একা আমার আর কাউকে ভাগ করে দিতে পারব না।

যাইহোক, বালিগঞ্জ প্লেসে একদমে পৌঁছে গেলাম। এবার বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে যে বাড়ির নম্বরটা দেখেছিলাম, সেই নম্বরের বাড়িটা খুঁজতে আরম্ভ করলাম। এগলি, ওগলি, এপাশের বাড়ি, ওপাশের বাড়ি ....না, ওই বাড়িটাতো নেই। আগের নম্বর আছে, পরের নম্বর আছে, ওই নম্বরটা নেই। রাস্তায় একটা লোকও নেই। হঠাৎ যেন পুরো ভূতের নগরী হয়ে গেল কোলকাতাটা। সে সময়ে ঐসব অঞ্চলে অনেক গাছ ছিল। গাছের ডালে ডালে পাখির ওড়াউড়ি আর ডাকাডাকি ছাড়া কোনও শব্দই নেই। একটা দুটো গাড়ি কখনও সখনও হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাড়িটা গেল কোথায়! এইরকম জায়গাতেইতো হবার কথা।

মনেপড়ল বাবা একদিন 'ভুলো ভূতের গল্প' বলেছিলেন। সেই ভুত ধরলে নাকি সব কিছু ভুল হয়ে যায়। পথ, ঘাট, বাড়ি কিছুই চিনতে পারা যায় না। সেটা বুঝতে পারার পর যদি গায়ের জামাকাপড় একটু ঝেড়ে নেওয়া যায়, তখন সেই ভুত চলে যায়। সেই গল্প মনে পড়তেই জামাকাপড়গুলো ভালো করে ঝেড়ে নিলাম। আবার বাড়ি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, এবারও খুঁজে পাওয়া গেলনা। প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুরে ঘুরে অবশেষে ধাঁ করে দৌড়ে এসে ১০ নম্বর বাসে হাওড়া হয়ে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করলাম। মনে বিপুল অশান্তি। যেখানে রোজ পাক খেতে আড্ডা দিই, সেই রাস্তায় একটা বাড়ি খুঁজে পেলাম না।

মনের অশান্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। পরের দিন কলেজ থেকে টিফিনেই বেরিয়ে পড়লাম। আজ খুঁজে বার করবই করব। বালিগঞ্জ প্লেসে এসে দেখি ওমা! অবাক কাণ্ড! ঠিক য়ে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে গতদিন গা থেকে 'ভুলো ভূত' তাড়িয়ে ছিলাম, তারই ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। বাড়ির সামনের কাপড়ের তোরণের তখনও বাসি ফুলের মালা ঝুলছে। তারই একপাশে নীলুদা মাল গোটাচ্ছেন। আমায় দেখে বললেন, 'এইতো আধ ঘন্টাটাক হল বাবাগেলেন। আর একটু আগে এলেই দেখা হয়ে যেত।'

এই বাড়ি? এই বাড়ি! গতকাল না হলেও পাঁচ-ছবার এই বাড়ির সামনে দিয়ে গেছি। তখন এ বাড়ি চোখে পড়ল না। এ বাড়ির ওই কাপড়ের তোরণ, অতো বড় প্যাণ্ডেল, এখনোও কত গাড়ি। এসব কিছুই চোখে পড়ল না! উল্টোদিকের বাড়িটার সাদা পাঁচিল, ভেতরে বোগেন ভেলিয়া - এতো গতকালই দেখেছি। এই বাড়িটা তখন কোথায় ছিল?

তাই বলছিলাম তিনি ইচ্ছে না করলে কিছুই হবে না। আর ইচ্ছে করলে? তিনি অঘটন ঘটন - পটীয়ান - অসাধ্য সাধন।

পিতৃ তর্পন

শ্রী বিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই পিতামহ ও পরে পিতাকে শরৎকালের পিতৃপক্ষে (মহালয়া অমাবস্যার আগের পূর্ণিমার পরেই প্রতিপদ তিথি থেকে মহালয়া পর্যন্ত মোটামুটি পক্ষকাল বা পনেরোদিন) প্রাতঃ সন্ধ্যাহ্নিকের পর তর্পণ করে জল দিতে দেখেছি, যা আমিও এখন করি। তাছাড়া কাঙ্ক্ষিত মৃতজনের জন্য নিত্য তর্পণের বিধিও আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রেরা সকলেই তর্পণ করতে পারেন। পিতা জীবিত থাকলে প্রয়োজনে প্রেততর্পণ (কারও মৃত্যুর পর সপিণ্ডকরণের (বাৎসরিক শ্রাদ্ধ) আগের দিন পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর করা হয়। তাছাড়া অন্য তর্পণ করা যায় না। মাতার জীবনকালেও মৃত পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ ও গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করাও শাস্ত্রীয় বিধি সম্মত (উদাহরণ নিমাই পণ্ডিতের গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান)। [পিতার জীবনকালে অন্যের জন্য তর্পণ করার নিষেধ এসেছে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক রীতি থেকে। তবে এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তর্পণ করতে নেই বলার বিধান আজকাল কেউ বিশেষ মানে না।]

রামায়ণ মহাভারতের বহুস্থানে মৃতজনের উদ্দেশে তর্পণ করার উল্লেখ আছে (দশরথ, জটায়ু, পাণ্ডু, ভীষ্ম ইত্যাদি)। সে যুগের আগে থেকেই আর্য সমাজে এই মৃতজনকে জলদানের বিধি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বেদের ও উপনিষদের কাল থেকে আত্মা ও পুনর্জন্মের ধারণা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সমাজে এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে বলে বোধ করি। আজকাল শুধুমাত্র মহালয়া অমাবস্যাতেই (তর্পণ করতে ইচ্ছুক) বেশীরভাগ লোককে জলদানের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায় - কেউ কেউ নদীর প্রবাহমান স্রোতের জলে তর্পণ করে তৃপ্তি পান। (জলে তর্পণের সময় ভুমিতে এক ও জলে অপর পা রেখে মুক্ত বাতাসে তর্পণ - এতে হয়ত ত্রিভুবনের স্পর্শ পাওয়া যায়।) আবার কেউ কেউ নিজের বাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত মনে পিতামাতাসহ পূর্ব পুরুষদের বংশানুক্রমিক ভাবে উদকাঞ্জলি দেন। কেউ কেউ এই প্রথাকে হাস্যকর মনে করেন, আবার অনেকে (অন্য ধর্মেরও) এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকারী জলদানকে বিশেষ সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বিচার করে একে সমর্থন করেন।

গল্পে উপন্যাসে এই তর্পণ প্রথা নিয়ে নানা কাহিনি পাওয়া যায়। বনফুলের একটি ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি। ভাদ্রমাসের শেষ নাগাদ কড়া রোদের দুপুরে উঞ্ছনি দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ীর বৈঠকখানায় এসে থার্ড পণ্ডিত মশাই বসলেন, যেখানে তিনি পড়াতে বসতেন। বললেন বড় তৃষ্ণার্ত! বাবা জল দে তো। আমি মাজা ঝক্‌ঝকে সেই কাঁসার গ্লাসে করে মাটির কলসীর জল এনে দিতে তিনি নিমেষে তা পান করে আরও দু'গ্লাস খেয়ে বললেন আঃ তৃপ্ত হ'লামরে বাবা! ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙতে মনে পড়ে গেল আজ মহালয়া! দূরের গঙ্গায় গিয়ে তাঁর তর্পণ করলাম, থার্ড পণ্ডিত মশাই অপুত্রক ছিলেন।

১৯৮০ সালে বসন্তকালে (মধুগয়া কৃত্য) গয়া ক্ষেত্রে ফল্গুতীরে তর্পণ করতে গিয়ে আসনে বসে পাণ্ডাদের লাল খেরো বাঁধাই বিরাট খাতায় স্বর্গতঃ দাদা, বাবা, ঠাকুরদা, (প্রপিতামহ কম বয়সে গত হন- তাঁকে বাদ দিয়ে), বৃদ্ধ প্রপিতামহ ও অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের (শেষ দুজন পদব্রজে গেছেন) হস্তাক্ষর ও পিণ্ড দানের তারিখ দেখে আপ্লুত হয়ে কিছুক্ষণ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দু'টি কাহিনিই ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা ধরেই চলেছে।

এই (সামবেদীয়) অনুষ্ঠানে ভারতের কিছু তীর্থ (কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রভাস ও পুস্কর) ও গঙ্গা নদীকে আহ্বান করে তর্পণ কালে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রজাপতিকে জল দান করে পৃথিবী বক্ষে দেবগণ থেকে শুরু করে প্রাণধারী সকল জীব ও তরুর জন্য সচন্দন যব মিশ্রিত সলিল দান করে তাদের আপ্যায়ণ সম্পূর্ণ হয়। পর পর মনুষ্য তর্পণ, ঋষি তর্পণ (এখান থেকে সতিল) দিব্য পিতৃতর্পণ করার পর যমরাজ ও ভীষ্মের নাম করে জল দেওয়া হয়। মূল অনুষ্ঠান থাকে মৃত পিতা, মাতা ও তাঁদের পূর্ববর্তীদের আহ্বান করে নাম ও গোত্র ধরে ধরে সতিল গঙ্গাজল (অভাবে আরব্ধজল) দিয়ে, সবান্ধবে তৃপ্ত করার পর, অগ্নিদগ্ধ সকল জীবকে সতিল গঙ্গোদক অর্পণ করে পরমগতি কামনা করা হয়। রাম তর্পণ [ওঁ আব্রহ্ম - ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃমানবা, তৃপ্যন্তু পিতরঃসর্বে মাতৃমাতা মহাদয়ঃ। অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদীপ নিবাসিনাম। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবত্রয়ম্।।] ও লক্ষণ তর্পণে [ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।] বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণের স্পর্শ পাওয়া বস্তু তথা বিশ্বমানবত্বকে সম্মান করে, সব অপূর্ণতা জন্য ক্ষমা চেয়ে হরিনাম কীর্তন করে তর্পণ শেষ হয় পিতা মাতার স্তুতি ও সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই বিধি যুগে যুগে সুসংস্কৃত হয়েছে মনে করা যেতে পারে।

ভারতের জলবায়ু ধরে বিচার করলে দেখা যায় বর্ষায় প্রচুর বারিপাতে ধরিত্রীর মাটি তার গর্ভে নানা বীজ ধারণ করে প্রচুর গাছপালা ও লতাপাতার জন্ম দেয় মায়ের মত। তারপর বর্ষণের বিরতি হ'লে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে পিতার মত পালন করতে থাকে পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে বিকিরিত আলোক ও তাপশক্তি - সালোকসংশ্লেষ ও অন্য জীবনরাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এই সময়ই আসে পিতৃপক্ষ।

এই রকম বলা হয় যে, বংশধরদের ডাকে পরলোক থেকে সূক্ষ্মভাবে পিতা, মাতা ও তাঁদের বংশের মৃতজনেরা (একই গোত্রের) সবান্ধবে এসে জল গ্রহণ করেন। দেবী পক্ষের উৎসবের শুরুতেই তাঁদের উপস্থিতি কামনা করলে তাঁরা থাকেন ও উৎসবের শেষে গৃহস্থের দেওয়া চোদ্দপ্রদীপ দেখার পর নিজের নিজের লোকে ফিরে যান দীপান্বিতার / দীপাবলীর আলো দেখতে দেখতে। তাছাড়া আকাশ প্রদীপও তাদের যাত্রা পথ আলোকিত করে [আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার শুরুতে (প্রদোষে) উচুঁ গাছে বা ছাদে লম্বা বাঁশ বেঁধে দড়ির সাহায্যে একটি খাঁচায় আকাশ প্রদীপদান এখনও গ্রামে ও শহরে দেখা যায়। আজকাল বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রদীপের জায়গায় ইলেক্ট্রিক বাল্ব্ ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ প্রদীপদানের এই পদ্ধতি বংশগত রীতি হিসাবেই পালিত হয়।]

তর্পণের সময় ধূপদীপ ও সচন্দন পুষ্প সহিত এই সুন্দর অনুষ্ঠানও তার আনুসঙ্গিক আচার মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে আত্মিক তৃপ্তি আনে। বিশেষ কিছু কিছু তীর্থে ও বিশেষ করে গয়ায় তর্পণ ও পিণ্ডদান স্মরণাতীতকাল থেকে (পৌরাণিক?) চলে আসছে। মনে রাখতে হবে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

তর্পণ মন্ত্রের জন্য দেখুন ঃ- পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা - ৯

শাপে বরে রাবণ

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

সেদিন বসে বসে রামায়ণ পড়ছিলাম। হঠাৎ মনে এলো এখানে যদি রাবণ চরিত্রটা না থাকতো তো কেমন হতো! রাবণ বিহীন রামায়ণ কি বড্ড পানসে পানসে লাগতোনা? রাবণ না থাকলে রাম কার কাছে কোথায় বীরত্ব দেখাতেন? আমাদের প্রবাদই আছে 'রাম রাবণের যুদ্ধ'। অন্ধকারের পাশে আলো যেমন আরও উজ্জ্বল দেখায় রাবণের পাশে রামও তেমনি উজ্জ্বল ভাবে শোভা পান। তবে রাবণও যেমন তেমন ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল, গুণও ছিল অনেক।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণ ও তাঁর পূর্বজদের বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলা আছে। শাপে বরে মিলিয়ে রাবণের চিত্র অনন্য। এবার তাঁর সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করি। জন্মসূত্রে রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। বিশ্রবা মুনি ও কৈকসীর সন্তান তিনি। দৈব দুর্বিপাকে অশুভ মুহূর্তে জন্ম হওয়ায় তাঁর মধ্যে আসুরিক ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে। পিতৃদত্ত নাম তাঁর দশগ্রীব। রাবণ নামটি পান মহাদেবের কাছ থেকে। কি করে তা পরে আসছি।

প্রথমে আমি রাবণের রূপ প্রসঙ্গে আসি। হনুমান সীতার খোঁজে যখন লঙ্কায় এসেছিলেন তখন রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান। এর আগে হনুমান কখনো এরকম দীপ্ততেজ সম্পন্ন রূপ দেখেন নি। রাবণের সর্বাঙ্গে যেন তেজ ও জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। বিশাল দেহ, মাথায় রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট। পট্টবস্ত্র পরিহিত, সর্বাঙ্গ সুবাসিত রক্তচন্দনলিপ্ত। তাঁর গাত্রবর্ণ গাঢ় নীল। বিশালদেহের মানানসই মুখখানিও বেশ বিস্তৃত। তাতে উজ্জ্বল স্ফটিকের মত ধারালো দাঁত - মাঝে মাঝে তা ঢাকা পড়ছে, মাঝে মাঝে তা দেখা যাচ্ছে। বিস্তৃত বুক স্বর্ণহার শোভিত, সুন্দর মুখের আভার সঙ্গে সব যেন মানানসই। হনুমান মনে মনে চিন্তা করল। রাক্ষসরাজের কি রূপ! কি তেজ! কি পরাক্রম! কি ধৈর্য্য এবং দীপ্তি। যদিও তাঁর গায়ের রং গাঢ় নীল কিন্তু রাজঅঙ্গে সর্বসুলক্ষণ বিরাজমান।

এতো গেল তাঁর রূপ, এবার গুণটিও দেখি। ভাইদের নিয়ে অনাহারে তিনি গোকর্ণ আশ্রমে দশহাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। এর ফলে মানুষ বাদে সকলের এমনকি দেবতাদেরও অবধ্য হন তিনি। এছাড়াও ব্রহ্মার বরে তিনি ইচ্ছেমত রূপও ধারণ করতে পারতেন।

এবার আসি শাপের কথায়। একবার চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্নায় কৈলাস শিখরের শোভা দেখতে দেখতে সেখানে রম্ভাকে দেখে রাবণ তার প্রতি অশালীন আচরণ করেন। রম্ভার প্রেমিক নলকুবর একথা জানতে পেরে এই অভিশাপ দেন, যদি রাবণ কোন অনিচ্ছুক নারীর সঙ্গে বলপূর্বকঅশালীন আচরণ করেন তবে তার মস্তক সাতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে।

এতো গেল প্রথম শাপের কথা, এবার আসি দ্বিতীয় শাপের ব্যাপারে। একবার রাবণ তাঁর পুষ্পক রথে ভ্রমণ করতে কার্তিকের জন্মস্থান শরবনে এসে পড়লেন। সেখানে আসতেই তাঁর রথের গতিরুদ্ধ হয়ে গেল। ভগবান মহাদেবের অনুচর নন্দী এসে বোঝাতে লাগলো, - শঙ্করের এই

ক্রীড়াস্থলে অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। রাবণ নন্দীর বানর সদৃশ মুখ দেখে হেসে উঠে বললেন, "আমার গতি অপ্রতিরোধ্য, দরকার হলে আমি এই পর্বত উপড়ে ফেলবো।" এই শুনে নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, 'আমার মত বানরেরাই একদিন তোমার রাক্ষস বংশ ধ্বংস করবে।' একথা শুনে ক্রোধবশে রাবণ কৈলাসপর্বতকে সজোরে ধরে ওঠাতে গেলেন। এতে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটু চাপ দিতেই রাবণের হাতের আঙুল পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে গেল। বিকট শব্দে চিৎকার করলেও তাতে কেউ কর্ণপাত করলোনা। বহুদিন পর রাবণের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে আশুতোষ মহাদেব রাবণকে মুক্ত করে দিয়ে বল্লেন, রাবণের বীরত্বে তিনি তুষ্ট। তার পর্বতভারে পীড়িত হয়ে প্রবল বেগে রব করার জন্য এখন থেকে তার নাম হোল রাবণ। এর আগে তিনি দশগ্রীব নামেই সুপরিচিত ছিলেন।

মূল রামায়ণে অনেক সময়ই তাঁকে দশগ্রীব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিব সন্তুষ্ট হওয়ার পর রাবণ তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রহাস নামে এক মহাদীপ্ত খড়্গ লাভ করেন।

এইভাবেই শাপে বরে মিলিয়ে রামায়ণে রাবণ এক অনন্য চরিত্র।

এই শ্লোকটি বড় মহারাজ বলতেন

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহরপিশাচাঃ সহচরাঃ।
চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলম্।
তথাপি স্মৃতৃণাং বরদপরমং মঙ্গলমসি।।

এইটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে এটি তিনি মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলেন এবং প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। মানেও বুঝিয়ে দিতেন এইভাবে -

কী বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় এই ভগবানের, দেবাদিদেব শঙ্করের স্বরূপ। তাঁর বাইরের সব ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা অমঙ্গলে ভরা। শ্মশানে তাঁর বিহারভূমি, ভূত-প্রেত-পিশাচরাই তাঁর সহচর বা সঙ্গী, গায়ে তাঁর চিতাভস্মের প্রলেপ, গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা। সুতরাং শীল বা আচরণ তাঁর সবই অমঙ্গলজনক অথচ নামটি তাঁর 'শিব' অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়। বাইরের দিকে তাঁর কাজ-কারবার দেখতে গেলে সবই অমঙ্গল আর অন্তরের অন্তস্থলে আপন স্বরূপে তিনি শুধু মঙ্গল। অমঙ্গল দিয়ে বাইরের সবটা ঢেকে রেখে তিনি নিজের আসল রূপটি জানতে দেন না। বিভ্রান্ত ক'রে যেন দূরে ঠেলে দেন সবাইকে, শুধু যে অন্তরঙ্গ, পার্বতীর মতো একান্ত তপস্যায় তাঁকেই শুধু পতি বলে বরণ করে, তার কাছেই তাঁর যথার্থ স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২১ সাল	১৪২৮ সন	উপলক্ষ্য
৭ই অক্টোবর	২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ, ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
১১ই অক্টোবর	২৪শে আশ্বিন, সোমবার	প্রাতঃ ৬।২৩।৭ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর পঞ্চমীবিহিত পূজা প্রশস্তা। ঘ ৬।২৩।৭ মিঃ এর পরে মহাষষ্ঠী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
১২ই অক্টোবর	২৫শে আশ্বিন, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর নব পত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।
১৩ই অক্টোবর	২৬শে আশ্বিন, বুধবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সন্ধিপূজা রাঃ ঘ ১১টা।২৩।৪৯ থেকে সন্ধিপূজা আরম্ভ। ঘ ১১।৪৭।৪৯ থেকে বলিদান। রাত্রি ঘ ১২।১১।৪৯ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।
১৪ই অক্টোবর	২৭শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবমীবিহিত পূজা প্রশস্তা। শ্রীশ্রীচণ্ডীযজ্ঞ ও পূর্ণাহুতি।
১৫ই অক্টোবর	২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা, বিজয়াদশমীকৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।
২০শে অক্টোবর	২রা কার্তিক, বুধবার	শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা, দেওঘর আশ্রমে ও পুরীতীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।
৪ঠা নভেম্বর	১৭ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহোৎসব।
৫ই নভেম্বর	১৮ই কার্তিক, শুক্রবার	দেওঘর আশ্রমে অন্নকূট মহোৎসব।
১৩ই নভেম্বর	২৬শে কার্তিক, শনিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা।
১৩ই ডিসেম্বর	২৬শে অগ্রহায়ণ, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ১১৮তম শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা, সাধু ভাণ্ডারা ও কম্বল দান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ। জামির লেন সহ অন্যান্য সকল আশ্রমেও জন্মতথি উৎসব পালিত হইবে।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২২ সাল	১৪২৮ সন	উপলক্ষ্য
৫ই ফেব্রুয়ারী	২২শে মাঘ, শনিবার	দেওঘর আশ্রমে শুভ বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীবালা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীমাতার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা।
১৪ই মার্চ	২৯শে ফাল্গুন, সোমবার	পুরী, শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং রাত্রে শ্রীমহা-প্রসাদ সেবা।
১৫ই মার্চ	৩০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে পরমগুরুমহারাজজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ৪ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, অভিষেক, অখণ্ড নামকীর্তন, ভাণ্ডারা দরিদ্র নারায়ণ সেবা।
১৭ই মার্চ	২রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার	সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা।
১৮ই মার্চ	৩রা চৈত্র, শুক্রবার	শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি , দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজা।
৩০শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল	১৫ই চৈত্র, বুধবার থেকে ১৭ই চৈত্র শুক্রবার	হৃষিকেশ আশ্রমে সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বার্ষিকতিথি উপলক্ষে ৩ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, ভাণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
৩রা এপ্রিল	১৯শে চৈত্র, রবিবার	পুরীর শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীমোহনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে শ্রীশ্রীনর্মেদশ্বর শিবের ৪র্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ষোড়োশোপচার বিশেষ পূজা, রুদ্রাভিষেক, যজ্ঞ এবং ভাণ্ডারা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।
৪ঠা এপ্রিল	২০শে চৈত্র, সোমবার	দেওঘর তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
৮ই এপ্রিল থেকে ১০ইএপ্রিল	২৪শে চৈত্র শুক্রবার থেকে ২৬শে চৈত্র রবিবার	বারাণসী তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার প্রতিষ্ঠাতিথি,শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর এবং তৎসহ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৩ দিবসব্যাপী লঘুরুদ্র যজ্ঞারম্ভ বিশেষ পূজাপাঠ, অভিষেক, সাধুভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠান।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২২ সাল	১৪২৯ সন	উপলক্ষ্য
১৫ই এপ্রিল	১লা বৈশাখ, শুক্রবার	জামিরলেনস্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ও ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হইবে।

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা অনুসারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ

সকল আশ্রমে **সরকারের (Govt.)** তৎকালীন করোনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য থাকিবে।

গুরু হে আমার

শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গুপ্ত

এইভবেতে আমি এক ক্ষুদ্র ইস্‌টিশন,
এই টিশনে ছয়খান গাড়ি
তাদের ছুটার লাগি তাড়াতাড়ি
যদি তাদের রুখতে নারি
কী হবে উপায়, গুরু কী হবে উপায়?
গুরু তুমি আমার টিশান মাস্টার,
তুমিই আমার ডেরাইভার -
তুমি ঠিক লাইনে চালাও গাড়ি
তবেই গাড়ি হবে পার,
গুরু হে ওগো গুরু হে আমার।
তোমার চরণ স্মরণ করি
ছেড়ে দিলেম জীবন গাড়ি
আর আমার নেই কোন দায়
জানি তুমি করবে উপায়।
তুমি যখন সহায় থাকো
টিকিটখানাও লাগেনাকো
গুরু হে গুরু হে আমার।।
অনেক আশা বুকে করে -
এসেছি আজ তোমার দোরে
তুমি পিতা, তুমিই মাতা
তুমি পরমবন্ধু পরিত্রাতা।
চরণেতে রাখো মোরে
কাছ ছাড়া আর কোরো না।
সাঙ্গ হলে ভবের খেলা
শেষ টিশনে পাবো দেখা।
হাতটি তুমি ধরে আমার
করে দেবে ভবের পার -
গুরু হে গুরু হে আমার।।

God I have seen without knowing

Sri Aniruddha Ray

Feeling cock-a-hoop over the feat of achieving divine Darshaan and listening to Kirtan recitals of Gurudev for a fairly long period, I elaborately narrated enthusiastically the details of happenings over the last eventful month without leaving aside the subtle nuances to my father and elder sisters who, in turn, took cognizance of my earnest yearning to become Gurudev's disciple someday.

Father in particular was visibly overjoyed finding me having lifetimeexperience of divine association of GURU MAHARAJJI. But he also drew my attention towards the ensuing annual examination. He directed me affectionately to study effectively. So routine life began as usual.

While walking down the roads at any time of the day, I often sighed wistfully, had I been privileged enough to find Maharajji's cars passing the way again all on a sudden, just as it happened once on a Sunny Sunday Morning at Chandannagore years before! But my wishful thinking of meeting him all on a sudden did not actually work out for years.

I had a hunch, in fact, I was convinced somehow that Gurudev wanted me to be specifically motivated in carrying out studies with all earnestness to meet the burgeoning demand of the family. Notwithstanding my innermost deprivation of not meeting him for long, I was blessed to channelise my erstwhile energies and grit to better my results in school examinations during the following years.

Meanwhile we left Suri for good to settle in a suburban town near Calcutta. I was admitted to class XI in a local H.S. School. With new teachers and friends, I somehow felt at home before long. One of my aunts has her house there. By then, it was time for my admission to a college. I was admitted to Serampore College.

On the first day there, the sight of a statue of blessed Mary cuddling baby Jesus with all tenderness awestruck me and sent a wave of undulating admiration. The immortal image is a testament of a luminous baby reminding Maharaj instantly and an equally loving mother doting her affection through the universal portrayal of love and benediction. It further brought out an image of a forgotten past that I harboured and preserved so long, not letting anyone know of its existence, in a secret closet at the core of my heart-a faintly glowing image resembling my long-lost mother dear.

Forbearance finally yielded coveted result. In one languid afternoon, the momentous news came like lightning flash that Maharaj was scheduled to arrive the next day at my aunt's house in Dhanbad and stay there for three days.

Frantically, we completed packing and boarded the morning train to Dhanbad along with my other aunt's family. At last, at long last, we would bathe in blissful divinity! The sheer anticipation of upcoming serene joy gave me a real lift.

"Would Maharajji allow me to be his disciple?", the long - awaited question started haunting me. The speeding train left a trail of rumbling, chugging sound creating an ambiguous sound effect echoing the words rhythmically "yes...no...yes...no...yes...no". Swinging from affirmation to negation, the personified sound put a toll on my overwrought nerves, as if, it could pronounce the final verdict whether I would be bestwed divine blessings to be his disciple or would I have to endure yet another painstaking waiting session for an unknown period of time!

My heart pounded with mixed excitement for I didn't know what was in store for me while the fast moving train charging along changing tracks in quick successions, whizzed past small stations to reach its final destination Dhanbad ! In the drawing room of the house, among other art pieces, there was a mini marble statue of the sculptor Michelangelopieta - mother Mary holding Jesus on her lap after crucifixion that attracted our attention. Uncle during one of his foreign trips purchased it.

It was a striking piece of art bearing *"wounds of love"*. The biblical interpretation runs that Jesus inflicted the wounds onto himself in order to redeem mankind from eternal damnation.

Later on I heard from senior disciples how most people from western countries were awestruck when they, either as visitors or simply as bystanders chanced to see Maharaj. Finding phenomenal similarity of physical traits and divine grandeur with Jesus standing on the cross, they unequivocally conceded that Guru Maharaj was indeed the modern immaculate replica of Jesus - a true descent, unfailingly a second coming of Christ, the Redeemer.

The house was already buzzing with cheerful presence of relatives and disciples. After light refreshments, we were assigned different jobs of decorating the sprawling lawns already covered with tarpaulin, cleaning the entire area giving the final touch and most importantly decorating the room where Gurudev would adorn for the coming three days. Along with some other cousins, we set to work without wasting time and got into Gurudev's room. Lady members headed towards kitchen to help preparing *Bhog* Prasad of Gurudev under the direct supervision of aunt. My eldest brother and other male members were assigned to look after the preparation of Bhandara in the backyard where a fairly large canopy was set above to facilitate proper space for cooking, storing and serving food to guests, disciples, family members and all others.

Amidst fun and laughter, we all worked together with a sense of fulfilment and joy. A slight mistake on anyone's part would invariably fetch pleasant rebuke from aunt for she would virtually not allow slightest lapses in making the inner sanctum clean, tidy and fragrant. Young girls and our sisters were making garlands of fresh flowers in one corner of the drawing room. An air of festivity, long overdue, ran through the house where local residents too joined hands to make the biggest event remarkably memorable. Completing the decoration, we enjoyed afternoon tea.

Uncle told me and another cousin to get ready fast for we would go to receive Maharajji midway. Elated at such a turn of event and at our sheer luck, we changed dresses as fast as we could. Meanwhile driver Hembram steered the car down the driveway.

About a distance of 15-20 km. down on the main road, our car waited for Maharajji's convoy of cars. It was the moment of moments when we spotted the long chain of cars from a far. Soon Maharajji's car stopped before us. we stood with folded hands. Maharajji blessed all of us and took his seat in the front. Taking final turn of the street towards the house, Hembram blew the horn to let insiders know that Maharaj had just reached the house. The house was illuminated with his divine presence. The air around was delicately fragrant. Incense sticks were lit up at different corners of the house. Fresh flowers, various garlands and above all that indescribable celestial aroma transformed the entire atmosphere into a small portion of paradise on Earth.

we all got busy transferring luggage from cars to Maharajj's room. Soon aunt along with lady members made arrangements to welcome our Lord in the traditional way following all rituals. Washing his lotus feet with sacred Ganges water and coconut water and wiping them with a soft towel, offering flowers and garlands at his feet, she began the welcoming song *"Jai Jagadish Hare"* pouring down all her devotion and we too joined the chorus. The atmosphere in its entirety was transformed into numinousness with Maharaj sitting on the bed and we all were emotionally stirred and knelt down before our Lord whispering prayers and sobbing in silence.

Around midnight Maharaj announced that the next morning would be *Diksha* day and casting a quick amused look at us, directed aunt softly to make us ready for Dikshaceremony. In one side of the room, we waited with bated breath for the final verdict. Oh what a moment!! Maharaj would allow us to be a part of his circle of disciples. Our prayer for such long period of time has finally been granted. There was a tone of finality in the announcement of Gurudev that made us weep openly in joy and happiness. At the end of the eventful day, we retired to beds waiting for a new dawn of hope, fulfilment and divine bond.

মহিমা তোমার

Today I would like to share one of the incidents which happened in my life with everyone.

I was very fortunate to have Gurudev's darshan at the age of 14 and thereafter innumerable things happened in my life-one of which I am writing now.

It was the year 1969, I was expecting my first and only child. We were settled in Bombay. Every month I used to visit my doctor attached to Elizabeth Nursing Home in Malabar Hill, for a routine check up. When I visited her in the 1st week of April, she said "look if you are planning to go outstation, please make it latest by 10th after that it will be very risky to take a train journey and airlines would not allow you". As my child's due date was 14th June, I told her that my mother would be coming to stay with me during that period.

Everything was going on fine until one night around end April when I woke up a bad dream that my mother had passed away in Delhi. I dreamt that by the time I reached Delhi it was very late and her body had been taken away for cremation. I started crying inconsolably. My husband also woke up hearing me crying. It was about 3 a.m. I started insisting that I would leave for Delhi by the 1st available train which at 7 a.m. Janata Express which had no AC and invariably late taking almost 30 hrs to reach Delhi. My husband kept on pleading that train journey was not advisable for me and airline also would'nt allow at that stage. But I kept on crying that I should leave. Eventually my husband managed to pacify me saying he would send me by the evening train- Frontier mail since it was well known for its punctuality, had ac and travel time was 24 hrs. So I agreed and went off to sleep.

As soon as I fell asleep I dreamt Guru Maharajji telling me "Child don't cry, your mother is fine and is coming to you shortly". When I woke up in the morning all the worries had gone and I felt so peaceful. Since I did not insist on going to Delhi, my husband happlily left for his office. My mother arrived within a week from Delhi and everything went off well. The same year I took diksha from Gurudev.

Over the years so many things have happened but those three sentences still ring in my ears and I shiver to think had Gurudev not stopped me what would have had happened.

Mrs. Sumitra Bhattacharya

Mumbai

DURGAPUR CANCER HOSPITAL

List of Donors (For the Period 01/03/2021 to 08/09/2021

Date	Rt. No.	Name	Amount
01/03/2021	1376	Purbani Mitra / Ashish Mitra / Sharmista Mitra Kolkata	5000.00
01/03/2021	1377	Ashis Mitra	50,000.00
12/03/2021	1329	Partha Sarathi Mukherjee & Uma Mukherjee	2,00,000.00
18/03/2021	1357	Pampa Chatterjee	501.00
18/03/2021	1358	Disciples of Guru Maharajji (Jadavpur)	6,211.00
02/03/2021	1328	Ipsita Dey (USA)	1,01,096.00
03/03/2021	1330	Barun Chanda & Manjushree Chanda	30,000.00
30/03/2021	1332	Jyotirmoy Banerjee	5,102.00
27/03/2021	1334	Bhumika Dogra, Kolkata	10,000.00
23/03/2021	1359	Chandra Gupta Ghosh & Dhrub Narayan Ghosh	5,001.00
23/03/2021	1360	Achyut Narayan Ghosh	5,000.00
05/04/2021		Ratnankur Roy Choudhuri	1,00,000.00
13/07/2021	1361	Ratna & Suromoy Ghosh Dostidar	10,000.00
14/07/2021	1335	Bandana Mahapatra, Kolkata	2,040.00
14/07/2021	1336	Chaya Basu, Kolkata	1,00,000.00
14/07/2021	1337	Soma Mitra, Kolkata	1,000.00
14/07/2021	1338	Jyotirmoy Banerjee, Kolkata	5,001.00
14/07/2021	1339	A Well-Wisher	1,200.00
25/07/2021	1340	Bandana Mahapatra	501.00
25/07/2021	1344	Sushim Kr. Munsi, USA	10,000.00
26/07/2021	1362	A Well-Wisher	5,000.00
27/07/2021	1364	Debjani Bakshi	2,000.00
27/07/2021	1363	Sunanda Gangopadhya	2,000.00
01/08/2021	1342	Minati Hazra	2,500.00
01/08/2021	1343	Ranjana Dutta	860.00
01/08/2021	1365	Chhaya & Gopal Sarkar	1,001.00
01/08/2021	1366	Ashis Bhadra	555.00
11/08/2021	1369	A Well-Wisher	1,001.00
11/08/2021	1368	Ashoke Kumar Sinha	5,001.00
01/09/2021	1370	Shankar Kanti Bhowmick	2,00,000.00
08/09/2021	1346	Aloke Kumar Mitra in memory of Polly Mitra	10,000.00

সমবেত ভজন ও একান্তে সাধন

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

"জলের স্বভাব তরল, মনের স্বভাব সরল। মন আবার নরম। কেননা ভগবান সেখানে থাকবেন বলে মনটা বেশ নরম করে তৈরী করেছেন। মন নরম বলেই মনে বেশি আঘাত লাগে। তবু মাঝে মাঝে আমরা সেটাকে গরম করে ফেলি। শক্ত করে ফেলি। ভুলে যাই তখন ওটা আমার প্রভুর বসবার আসন। বিশ্রামের জায়গা। যেই মনে পড়ে যায় কথাটা, অমনি মনটা নরম হয়ে যায়।" - স্বামীশিবানন্দগিরি

বাস্তবিকই তাই আমাদের হৃদয় আসনেই তাঁর বসার জায়গা করা দরকার। তিনি গেয়েছেন,

"হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদেরই ঘরে,
আসনটি তাঁর পেতে দে ভাই মনের মতন করে...."-

মন যদি জঞ্জাল - আবর্জনায় ভরে থাকে অর্থাৎ কলুষতা-হিংসা ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহলে তিনি সেখানে কোথায় বসবেন? কাজেই মনের সকল আবর্জনাকে পরিষ্কার করে তাঁর বসার যোগ্য করে তুলতে হবে। সবসময় সংসারী মানুষ সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘর পরিষ্কার করার সময় যদি মনে করি আমার প্রভু এই পথ দিয়ে আসবেন, বিছানা করতে গিয়ে ভাবি প্রভু এখানে বসবেন, রান্না করতে গিয়ে মনে করি আমার প্রভু তা' গ্রহণ করবেন - তাহলে কিন্তু কোন কাজ করতেই এতটুকু ক্লেশ আসবে না আর তার সঙ্গে সঙ্গে হবে তাঁর স্মরণ-মনন, সমস্ত কিছুতেই তিনিময় হয়ে থাকা। তবে বলা যত সহজ ততটা হয়তো করা সহজ নয়। তবুতো চেষ্টা থাকা চাই, তবেতো একদিন না একদিন তা সফলতার রূপ নেবে। তাইতো মহারাজ বলেছেন, "যে সংযমের দ্বারা মনের প্রসন্নতা লাভ হয়, একটি শান্ত সমাহিত অন্তর্মুখী প্রবণতা লাভ হয় এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবের অভিবৃদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মনিগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক তপস্যা।"

বর্তমানে এই ভারতবর্ষে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা অতি দুঃখজনক। যেখানে ভগবানকে গভীরতা ও ব্যাপকতায় পরম বলে পরমাত্মা নামে সম্বোধন করা হয়, জীবের সেবাকে জীবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের চেষ্টাকে প্রাচীন মুনিঋষিরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলে প্রচার করে গিয়েছিলেন, জীবের সেবাই যাঁদের কাছে ছিল শিবের সেবা, বর্তমানে সেখানে বিজাতীয় ভেদাভেদ এসে যেন আরও সর্বনাশের পথে যাওয়া হচ্ছে। একসময় যাঁদের ইষ্ট ছিলেন সর্বব্যাপী ভগবান, সাধনা ছিল সর্বভূতে আত্মদর্শনের ফলে সকল জীবের হিতসাধন, সেখানে বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে মা, বাপ, ছেলেমেয়ে, ভাইভাইকে এমনকি স্বামী স্ত্রীকেও আর প্রীতির চোখে দেখতে পারছে না।

স্বয়ং মহাপ্রভু, আমাদের গুরুমহারাজজী এনারা আমাদের ভিতরে প্রেমের ভাব আনয়ন করার জন্য এই সমবেতভাবে নাম করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সকলকে ধর্মপথে চালনা করিয়ে সংঘবদ্ধ করা ছিল ভগবান বুদ্ধের জীবনের প্রথম লক্ষ্য, বর্তমান যুগের শ্রীঅরবিন্দেরও এটাই ছিল মতবাদ। ঋষিদের প্রার্থনা মন্ত্রতেও আমরা দেখতে পাই "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্..... সুতরাং সকলকে নিজ নিজ প্রকৃত স্বরূপের একটা আভাস দিয়ে একত্রিত করা, সমষ্টিগত করা, ঈশ্বরকোটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মনে হয় গুরুদেব এই সমবেতভাবে নামের নির্দেশ আমাদের দিয়ে গেছেন।

আর পূজা বা সাধনা? তা কিন্তু একান্তেই করতে হয়। পূজার জন্য আমাদের শরীর, মনপ্রাণ ইন্দ্রিয়গুলির দরজা এমনভাবে খুলে দিতে হবে যাতে তাঁর সত্তা চৈতন্য আনন্দ দ্বারা পূর্ণরূপে প্লাবিত হতে পারে। তবেই আমরা তাঁর যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারব। পুজোর দ্বারা আমরা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হতে পারি।

তবে অহংকার থাকতে তা পাওয়া সম্ভব নয়। সম্পূর্ণরূপে হতে হবে তাঁর শরণাগত। তিনি ছাড়া আমার চোখ দেখতে পায়না, তাঁর কৃপা ব্যতীত আমার কিছুই করার শক্তি নেই। গুরু কৃপাহি কেবলম্। প্রথম প্রথম মনের একাগ্রতা নাও আসতে পারে, সেইজন্য নিয়মিতভাবে অভ্যাসের দ্বারা ভগবৎ প্রতিকূল ভাবসমূহ মন থেকে দূরীভূত করতে হবে। অনর্থের নিবৃত্তি হলে সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎতত্ত্ব বা প্রেম পদার্থ আপনিই প্রকাশিত হবে।

সেইজন্য একদিকে কীর্তন ও অপরদিকে তাঁর স্মরণ-মনন - এই দুইটিই আমাদের মুখ্য কর্মকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই, গুরুদেব গানের মাধ্যমে বলেছেন, "আর ঘুমায়োনা মন, হওরে সচেতন, ডাক রাধারমণ একান্ত চিতে।"

হরর্ণামৈব নামৈব নামৈব কেবলম্

কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।

•

পরম গুরুমহারাজ বলেছেন ঃ "কলৌ দানং হি কেবলম্, কলৌ নামৈব কেবলম্। এহি দানসে ঔর নামসে জীবকা গতি হো জায়েগা।" আরও বলেছেন ঃ 'দেনে চাহো তো অন্নদান দেও, আউর লেনে চাহো তো হরিকা নাম লেও।" একটি দেওয়া আর একটি নেওয়া। দানের প্রসঙ্গে আরও চিনিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন দানের কথা, ঔষধিদান, বিদ্যাদান, ধনদান।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজী

সম্পাদকীয়

আনন্দময়ীর আগমন

সমগ্র জগৎসংসার জুড়ে চলছে মহামায়ার খেলা। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মহামায়ার চক্রেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই মহামায়ার রূপ কী? তিনি সাকারা আবার তিনি নিরাকারা - যে সাধক যে রূপে তাঁকে সাধনা করেন সেই রূপই তিনি ধারণ করেন। সাধারণের পক্ষে নিরাকারা সাধনা সহজসাধ্য নয়। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেই তা সম্ভব। বিশ্বসংসারের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তিই হলেন সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণকারিণী। বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে তিনি সর্বসাধারণের জন্য হন প্রকাশিতা। মৃন্ময়ীমূর্তিই ভক্তমানসে চিন্ময়ীরূপে ধরা দিয়ে থাকেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই সব কিছুই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাশক্তিতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধজয়ের জন্য শরৎকালে দুর্গারূপে এই মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন তাঁকে তুষ্ট করতে - অকালে করেছিলেন বলে 'অকালবোধন', আবার শরৎকালে করেছিলেন বলে 'শারদীয়া' দুর্গাদেবী নামেই তিনি পূজিতা হন। আসলে ত্রিমাতৃকার পূজাই করা হয়। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো। সপ্তমীতে সত্ত্ব-বলতে সৃষ্টিকর্ত্রী দেবী সরস্বতীর পুজো - এই পুজোতে শিউলিফুল দেওয়া হয়, যার ওপরটা সাদা আর ডাঁটিতে কমলা, যেহেতু অষ্টমীতে রজঃ অর্থাৎ পালনকর্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা, যাতে লাগে রক্তজবা এবং সন্ধিপুজোর মহালগ্নে জ্ঞানমার্গে মা দুর্গার চরণে মহাভাবে সবাই বিমোহিত হয়ে পড়েন এবং বিশ্বাস করেন যে একটুক্ষণের জন্য হলেও মা এই সময়ে আর্বিভূতা হন। নবমীতে তমের অর্থাৎ মা দুর্গার পুজো হয় - এই পুজোতে লাগে নীল অপরাজিতা ফুল। দশমীতে সবাইকে কাঁদিয়ে মা-এর ফিরে যাওয়ার পালা। এই কদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে উৎসবের ধূম পড়ে যায়, তারাতো মাকে মনে করে নিজেদের ঘরের মেয়ে 'উমা'।

সবশেষে আমাদের এই প্রার্থনা হোক হে

শক্তিপ্রদায়িনী জগতের ধাত্রী 'মা' তুমি দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য অশুভ বিধ্বংসী শক্তিকে যুগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত ক'রে শুভশক্তি, শুভবুদ্ধি ও শুভচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের মুক্তির পথ দেখাও -এই-ই আমাদের আকুতি -

"তামাগ্নিবর্ণা তপসা জলন্তি বৈরোচনীং
কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাদেবীং শরণামহং প্রপদ্যে -
সুতরসিতরসে নমঃ।।"